‘দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য: বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ’

প্রিয়াঙ্কা বিশ্বাস, গবেষক (*সারসংক্ষেপ*)

ইতিহাসের দিকে দিক্‌পাত করলে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার মানুষের জীবনযাত্রার যে চিত্র আমাদের সামনে উদ্ভাসিত হয় তা হল এখানকার নিম্নবর্গীয় শ্রমজীবী, কৃষিজীবী মানুষের কঠোর সংগ্রাম চিত্র। বিপর্যস্ত প্রাকৃতিক পরিবেশের সাথে প্রয়োজনীয় ব্যবহারিক দ্রব্য সম্ভারের স্বল্পতা, এই মানুষগুলির অর্থনৈতিক পরিবেশকে এক অনিশ্চয়তায় ঘিরে রেখেছিল। তার সাথে ছিল রোগ, ব্যাধি, অকালমৃত্যুর মতো নানাবিধ সংশয়পূর্ণ বিপর্যয়। অসহায় দরিদ্র এই মানুষগুলির জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে এই বিষয়গুলি সৃষ্টি করেছিল উদ্বেগ, সংশয় ও আশঙ্কা। তার সাথে ছিল দিনরাত্রি, ঋতুপরিবর্তন, জন্মমৃত্যু, নিদ্রা ও স্বপ্নের বিকাশ ও অন্যান্য ঘটনাবলির বিচিত্র সমাবেশ। যা এই সকল নিম্নবর্গীয় দরিদ্র মানুষগুলির মনের মণিকোঠায় বহু অযৌক্তিক বিশ্বাসের অতিপ্রাকৃত বা অশরীরী শক্তি কল্পনার ভিত্তি স্থাপন করেছিল। গ্রাম্য, নিরক্ষর, অজ্ঞ, দরিদ্র এই মানুষগুলি যুক্তির যথাযথ কারণ অনুসন্ধানে ব্যর্থ হয়ে এই সকল শক্তিসমূহের ধ্যান-ধারণায় বা তুষ্টি সাধনায় সমবেত হয়েছিল। তারা চেয়েছিল এক নিরুদ্বেগ, নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবন। তারা আস্থা রেখে ছিল লৌকিক দেব-দেবীর উপর। আর সেই সমস্ত লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক ধর্মীয় উৎসবের মধ্যে তারা পেয়েছিল নিশ্চয়তাপূর্ণ জীবনের প্রাথমিক সন্ধানের আশ্বাস। ধর্মীয় উৎসবই হল অসহায় দরিদ্র এই মানুষগুলির জীবন সংগ্রামের কালজয়ী ঘটনার বাঙ্ময় মূর্ছনা। দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় কৃষিসমাজে গাজন উৎসব হল সেই রকমই একটি ধর্মীয় উৎসব। যেখানে কঠোর বাস্তব ও সংগ্রামে ঘেরা পরিবেশের বাইরে মানুষের বুদ্ধির অনতিগম্য, অতিপ্রাকৃত জগতের বিভিন্ন শক্তি সমূহের সন্তুষ্টি সাধনের মাধ্যমে পার্থিব সম্পদের অধিকারী হওয়ার এক সুকৌশল প্রচেষ্টার অভিব্যক্তি ঘটত। বহু বছর ধরে এই প্রচেষ্টায় মানুষ নানা ভাবে প্রভাবিত হয়েছে। প্রতি বছর সমবেত ভাবে কয়েকদিন ব্যাপী আচরণ পালনের মধ্য দিয়ে ক্ষুদ্র সাম্প্রদায়িকতা ও গোষ্ঠী চেতনার প্রাচীর ডিঙ্গিয়ে তারা আত্মার নিবিড়তায় পরস্পরকে আবদ্ধ করে তুলতো।

যুগ যুগ ধরে সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনা জুড়ে বিশেষত সুন্দরবনাঞ্চলের নিকটবর্তী অঞ্চলগুলির নিম্নবর্গীয় দরিদ্র কৃষিজীবী, শ্রমজীবী মানুষগুলির জীবনকে লৌকিক দেব-দেবী প্রভাবিত করেছিলেন। শিব হয়ে উঠেছিলেন তাদের ঘরের দেবতা। তাই সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনাব্যাপী অগণিত শিবমন্দির আর শিবের থান গড়ে উঠেছে। শিব এই মানুষগুলির জীবনে হলধর রূপে অবির্ভূত হয়েছেন। এখানকার অধিকাংশ জায়গায় লিঙ্গরূপী শিব পূজিত হন। শিব ও শিবানীর অভিন্নতা রূপের প্রকাশ এটি। শিব সৃষ্টির দেবতা, সংহারের দেবতা, উৎপাদন ও প্রজননের প্রতীক এবং শিবানী বসুমাতা ধরিত্রী, যেখানে উৎপাদন হয়। দক্ষিণবঙ্গের উপকূল সুন্দরবনাঞ্চল অধ্যুষিত বিশেষত কৃষিনির্ভর দরিদ্র মানুষগুলির জীবনে শিবকেন্দ্রিক গাজন নামক শস্য উৎসবটি ছিল চৈত্র মাসে পুরাতন বছরের শেষ ও নতুন বছরের প্রারম্ভের সন্ধিক্ষণে আগত বছরের সুখ ও স্বাচ্ছন্দ্য কামনার উৎসব। এই উৎসবটিকে মনে করা হত শিব-পাবর্তীর বিবাহ উৎসব। সেখানে শিবভক্ত

সন্ন্যাসীর দল অনুগামী বরযাত্রী। চারদিনব্যাপী নানান আচরণ পালনের সাথে সাথে শিব মাহাত্ম্যসূচক ধ্বনি ও গান করা হয় এই উৎসবে। গাজন আদিম একটি উৎসব। অন্ধবিশ্বাস, সংশয়, উদ্বেগ থেকে এখানকার আদিম অধিবাসীগণ আস্থা রেখেছিলেন লৌকিক দেব-দেবীর উপর। তাই লৌকিক দেব-দেবীকেন্দ্রিক এই উৎসবের মধ্যে নিহিত থাকে আদিম সংস্কার। চৈত্রমাসের শেষে চারদিনব্যাপী গাজন উৎসবের উন্মাদনায় একসময় সমগ্র দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গ্রামীণ হিন্দু এলাকাগুলি উদ্বেলিত হয়ে উঠত। ২৬শে চৈত্র স্নানের পর সন্ন্যাস গ্রহণ করেন ভক্তরা। ২৭শে চৈত্র থেকে ৩০শে চৈত্র পর্যন্ত নানান আচরণ, রীতি-নীতি পালন করা হয়। পয়লা বৈশাখের দিন উত্তরীয় কেটে পুকুরের মাটিতে স্থাপিত করে, স্নান সেরে নতুন বস্ত্র পরিধান করে আমিষ আহারের মধ্যে দিয়ে ফিরে আসেন নিজ গোত্রে। সম্পন্ন হয় গাজন উৎসবের। কৃষি নির্ভরশীল মানুষগুলির সারা বছরের সুখ স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করত শস্য উৎপাদনের উপর। তাই নতুন বছরের সূচনায় পালিত হওয়া শস্য উৎসবের সাথে মিশে থাকত এই মানুষগুলির ভক্তি ও নিষ্ঠা।

গ্রাম জীবনেও ছিল বিনোদনের অভাব। বিনোদনের জন্য ব্যয় করার মতো আর্থিক স্বাচ্ছন্দ্যেরও অভাব ছিল যথেষ্ট। গাজন উৎসবের শেষদিন রাত্রে সারারাত্রি ব্যাপী অনুষ্ঠিত হত মনোরঞ্জনমূলক পালা অভিনয়। এই গাজনপালা অভিনয় ছিল গ্রামের মানুষের কাছে অন্যতম বিনোদনের অঙ্গ। চৈত্র মাসের শুরুতে গ্রামের অধিবাসী গণ নিজেদের মধ্যে থেকে অভিনেতা, বাদ্যকার, নির্বাচন করে দল তৈরি করত। সন্ন্যাসী বা সন্ন্যাসী বহির্ভূত মানুষ সকলেই এতে অংশগ্রহণ করত। এরপর গ্রামেরই কারও বাড়িতে বা নাটমন্দিরে একমাস ধরে চলত গাজনপালার মহড়া। গাজন উৎসবের শেষ দিনে হত পালা অভিনয়। গাজন উৎসবের এই গাজনপালা নামক লোকনাট্যটি ছিল গ্রামের মানুষের শিল্পচর্চার অন্যতম একটি মাধ্যম। গ্রামেরই অনেক প্রতিভাবান শিল্পী কেবলমাত্র জীবনের তাগিদে ও সুযোগের অভাবে শিল্পচর্চার সময় ও সুযোগ পেত না। তাদের কাছে গাজনপালা ছিল শিল্পচর্চার এক বিশেষ মাধ্যম। ক্রমে ক্রমে গাজন উৎসব থেকে আলাদা হয়ে গাজনপালা লোকনাট্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে। স্থানে স্থানে তৈরি হয় গাজন দল। দিনবদলের সাথে জনপ্রিয়তা বর্ধিত হওয়ায় গ্রামে গ্রামে যে সমস্ত গাজনদল গড়ে ওঠে এক সময় তাতে যুক্ত হয়েছে ব্যবসায়িক মনোবৃত্তি। রূপ নিয়েছে পেশাদারি গাজনদলের। বর্তমানে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনায় অসংখ্য পেশাদারি গাজনদল গড়ে উঠেছে ও তাদের কার্যালয় (গদিঘর) নির্মিত হয়েছে।

আলোচ্য গবেষণা সন্দর্ভের বিষয় হল- 'দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার গাজন উৎসব ও গাজন লোকনাট্য বিষয়, আঙ্গিক ও সমাজতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ'। সন্দর্ভটির প্রথম অধ্যায়ে প্রয়োজনীয় তথ্যাবলি সংগ্রহের উদ্দেশ্যে ক্ষেত্রসমীক্ষার অঞ্চলরূপে দক্ষিণ চব্বিশ পরগনার বিভিন্ন এলাকাকে নির্বাচন করে সেই অঞ্চলগুলিতে ক্ষেত্রসমীক্ষা করা হয়েছে। গবেষণা সন্দর্ভের দ্বিতীয় অধ্যায়ে গাজনের ধর্মীয় উৎসবগত দিকটির প্রাথমিক পরিচিতি ও সামাজিক তাৎপর্যমূলক দিকটি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। তৃতীয় অধ্যায়ে লোকনাট্যরূপে গাজনপালার বৈশিষ্ট্য ও তার বিষয় বৈচিত্র্য এবং বিবর্তন সম্পর্কিত দিকটি আলোচিত হয়েছে। চতুর্থ অধ্যায়ে লোকনাট্য গাজনপালাগুলির পরিবেশনের আঙ্গিক, সময়, আসর, বাদ্যযন্ত্র, যন্ত্রানুসঙ্গ, অভিনেতা, দর্শক ও অতিরঞ্জনমূলক দিকগুলিতে আলোকপাত করা হয়েছে। একেবারে শেষ অধ্যায় অর্থাৎ পঞ্চম অধ্যায়ে দক্ষিণ

চব্বিশ পরগনার নিম্নবর্গীয় মানুষগুলির কাছে গাজন উৎসব থেকে উদ্ভুত হয়ে গাজনপালা অভিনয়ের বর্তমান সামাজিক পরিস্থিতি ও প্রভাব এবং তার ভবিষ্যৎ কি হতে পারে এই বিষয়টি আলোচিত হয়ে উপসংহারের মাধ্যমে গবেষণা সন্দর্ভটি সমাপ্ত করা হয়েছে।